The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ: একুশ শতকের বাংলায় শিক্ষানীতি

[Linguistic Imperialism: Educational Strategy in Bengal in The Twenty-first Century]

Monju Rani Das
Assistant Professor, Department of Bangla, Noakhali Science and Technology University, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 20 February 2025
Received in revised: 08 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Linguistic, Imperialism, Strategy, Strategy, Bengali

ABSTRACT

Language is one of the arms used by influential nation-states to unify cultural, economic and political authority. `Linguistic imperialism' is the theory of the displacement or extinction of the language of indigenous or colonial state through the representative language of aggressive political policies. Colonizers followed two policies of 'segregation' and 'integration' to annihilate the identified language. In 1757 the end of Nawabi regulation and establishment of English rule in Bengal contributed to the integration strategy of English language. In present, as `Lingua Franca' English almost dominates the whole world. Incidentally institutions like `International Monetary Fund' and `World-bank' have enacted a confirmatory role. English entered the institutional globe of Bengal in 1835 to promote western education and as an official language. Consequently, Bengali pedagogy is also affected. The journey of pedagogy is started by Socrates through `Socratic method' in ancient Greece. Nowadays, because of the concentration of power, the invasion of English language also exists in edification dogma. Particularly in third world countries, the impact of imperialist language has become one of the quality determinants of pedagogy. What position created by dominant influence of English in form of education in Bengal as an independent sovereign nation-state? Therefore how much intact the infrastructure of the Bengali language? Understanding the existing position of Bengal because of the strategy of linguistic aggression and at what level is the status of Bengali language in the educational policy- keeping these questions in front, the essay has been constructed.

একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বোচ্চ স্তর হলো সাম্রাজ্যবাদ। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের জন্য শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্রগুলো ভাষাকে অন্যতম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। রাজনৈতিক আগ্রাসনবাদী নীতির সহায়তায় পরাশক্তির প্রতিনিধি-ভাষার মাধ্যমে আদিবাসী বা উপনিবেশ রাষ্ট্রের ভাষার স্থানচ্যুতি বা বিলুপ্তির তত্ত্ব হলো 'ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ'। উপনিবেশবাদীরা চিহ্নিত ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করতে দুটি নীতিপথ অনুসরণ করে থাকে- 'বিচ্ছিন্নকরণ' এবং 'একীকরণ'। বাংলায় শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে একেক সময় একেকটি ভাষার আগ্রাসন লক্ষণীয়। ১৭৫৭ সালে নবাবী শাসনের অবসান এবং ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজি ভাষা একীকরণ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমান বিশ্বে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসেবে ইংরেজি সমগ্র বিশ্বে ভাষাগত আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ইংরেজি শিক্ষা প্রসার ও অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ১৮৩৫ সালে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক জগতে ইংরেজির অনুপ্রবেশ। প্রাচীন গ্রীসে সর্বপ্রথম সক্রেটিসের হাত ধরে 'সক্রেটিক পদ্ধতি'র মাধ্যমে শিক্ষাবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে প্লেটো, এরিস্টটল, দার্শনিক কনফুসিয়াস শিক্ষানীতির পরিচয় প্রদান করেন। ইদানীং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কারণে ইংরেজি ভাষার আগ্রাসন শিক্ষানীতিতেও বিদ্যমান। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষানীতিতে অন্যতম নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আছে। উপনিবেশ স্থাপনকারী শক্তি হিসেবে ইংরেজির ব্যাপক প্রভাব বাংলার আধুনিক শিক্ষানীতি প্রবর্তনে লক্ষ করা গিয়েছিল। বর্তমানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসেবে ইংরেজির সর্বগ্রাসী ভূমিকা বাংলা ভাষার শিক্ষাপদ্ধতিকে কোন অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে? এর ফলে বাংলা ভাষার অবকাঠামো কতোটা অক্ষত আছে তা অবশ্য বিচার্য। ভাষিক আগ্রাসননীতির কবলে পড়ে বর্তমান বাংলার অবস্থান অনুধাবন এবং বাংলার শিক্ষানীতিতে বাংলা ভাষার মর্যাদা কোন পর্যায়ে- এসকল জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্বের অর্থনৈতিক বন্টনপ্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব'টি প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এবং অর্থনৈতিক বিশ্বের বন্টনে একচেটিয়া নীতি অবলম্বন পুঁজিবাদী বিশ্বের মূলনীতি। ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম অনুষঙ্গ। বিশ্বরাজনৈতিক অঙ্গনে ক্ষমতার দণ্ড এবং অর্থনৈতিক দম্ভ দুই-ই ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম দুটি বিষয়। প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্বে ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ ১৯৯০-এর দশক হতে অন্যতম স্থান দখল করে আছে। ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্টাল যে *Language Death* নামে গ্রন্থ রচনা করেন তা মূলত ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার চাপে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভাষার বিলুপ্তির আলোচনা। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় রবার্ট ফিলিপসনের গ্রন্থ *Linguistic Imperialism*। এতে সাম্রাজ্যবাদী ভাষার আগ্রাসনের রীতিনীতি বর্ণিত হয়। ঐসময়ই অর্থাৎ ১৯৯২ সালেই International Linguistic Congress সম্মেলনে ভাষার বিলোপের জন্য ভাষাবিদরা উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। ফিলিপসন ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদে কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারকারী মনোভাবও আমলে নিয়েছেন। শাসনতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতার দাপটে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতির ভাষাকে স্থানান্তরের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর ভাষা জেঁকে বসে। স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও ক্ষমতাশালী ভাষা স্থানীয় ভাষাকে আক্রমণ করতে পারে। বিশ্বায়নের সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বর্তমানে যেভাবে ইংরেজি ভাষা সর্বত্র প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে তা এরই নিদর্শন। ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে রবার্ট ফিলিপসনের বক্তব্য:

> The study of linguistic imperialism focuses on how and why certain languages dominate internationally (become `world language') and attempts to account for such dominance in an explicit, theoretically founded way…It is almost certainly the language of the dominant power which is used as the medium of communication.[1]

ভাষা-সাম্রাজ্যবাদে ভাষার ক্ষমতা অপেক্ষা ক্ষমতার ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেহেতু এর সঙ্গে আধিপত্যবাদী শক্তি জড়িত সেহেতু ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়। ক্ষমতার ভাষা স্বাভাবিক প্রবহমানতা অস্বীকার করে অন্য ভাষার উপর নিয়ন্ত্রক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। 'ক্ষমতার ভাষা তার ক্ষমতার দাপটে অর্থনৈতিক স্বার্থে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক হেজিমনি প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য ভাষাকে গিলে ফেলতে চায়। ক্ষমতার এই ভাষাই হচ্ছে ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ।'[২] 'অর্থনৈতিক স্বার্থ' শব্দদ্বয়ের গুরুত্ব এখানে দৃশ্যমান। প্রভুত্ব বিস্তারকারী রাষ্ট্র মূলত প্রথম পদক্ষেপ রাখে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে। পর্যায়ক্রমে উপনিবেশায়ন এবং প্রত্যক্ষ উপনিবেশ ধ্বংসের পরও ফিনান্স পুঁজির প্রসার ঘটে। একইসাথে ঔপনিবেশিক শক্তির ভাষাও বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ আধিপত্যের যুগে ইংরেজি সমগ্র বিশ্বে ক্ষমতার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এজন্য একে সমাজ-রাজনৈতিক অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমাজে অবস্থানগত ক্ষমতার প্রেক্ষিতে একটি ভাষা তার আগ্রাসন চালায়। বলা হয়: '...the most powerful language dominates and marginalizes the less important languages.'[৩] তাই দেখা যায় ব্রিটিশ আধিপত্যের সময় সাত হাজার ভাষার বিশ্বে ইংরেজি হয় সাম্রাজ্যবাদের ভাষা। বিশ শতকে বিশ্বায়নের কালে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে বিশ্বভাষার স্থান দখল করে। ফিলিপসনের ভাষ্য অনুসারে ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ বিকাশে তিনটি পর্যায় বিদ্যমান।

১. ক্ষমতা প্রদর্শন ও ভাষাধিপত্য,
২. অভিজাত স্থানীয় সুবিধাভোগী শ্রেণিকে প্রশিক্ষণ,
৩. প্রযুক্তির সাহায্যে আদর্শিক প্ররোচনা।

'শিক্ষাপদ্ধতি' বা 'শিক্ষানীতি' হলো শিক্ষার রীতিনীতি সম্পর্কিত অধ্যয়ন। একে বাংলায় 'শিক্ষাবিদ্যা' এবং ইংরেজিতে 'Pedagogy' বলা হয়। একে শিক্ষা সম্পর্কিত বিজ্ঞানও বলা হয় যা বৌদ্ধিক, সামাজিক, মনোজাগতিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস সংলাপের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিদ্যা আহরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন যা আজ 'সক্রেটিক পদ্ধতি' হিসেবে খ্যাত। প্লেটো *রিপাবলিক* গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলেছিলেন। রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলেছেন তিনি। 'প্লেটোনিক শিক্ষাপদ্ধতি'র মূলকেন্দ্রেই ছিলো রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে কনফুসিয়াসের শিক্ষানীতির তিনটি মৌলভূমিই হলো- নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ধর্মীয়। ইতিহাসের ধারায় প্রবাহিত শিক্ষানীতি বিচার করলে দেখা যায় শিক্ষাবিজ্ঞান এমন এক বিদ্যা যেখানে যুক্তি, নীতি এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছে। Johan Karl Friedrich Rosenkranz তাঁর *The Philosophy of Education* গ্রন্থে শিক্ষাবিদ্যার সংজ্ঞায় এর বিশেষত্ব নির্দেশসহ বলেন:

> …the science of education treats of the process of development , by the through which man, as a mere animal, becomes spirit, or self-conscious mind; hence it presupposes all the science named, and will be defective if it ignores nature or mind, or any stage or process of either, especially anthropology, phenomenology, ethics, rights, aesthetics, religion or philosophy.[4]

এই বক্তব্য *Pedagogics As A System* গ্রন্থেও করেছেন- 'It is rather a mixed science which has its presuppositions in many others.'[৫] অর্থাৎ 'শিক্ষাবিদ্যা' হলো একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি।

ভাষার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হলো মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জন যেকোন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষেই সম্ভব বলে মনে করতেন সৃজনশীল ভাষাবিজ্ঞানের জনক নোয়াম চমস্কি। মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ জাতির মৌলিক অধিকার হিসেবে ব্যক্ত করেন লেনিন তাঁর 'জাতিসত্তার উপর নির্ভর করে স্কুলের পৃথকীকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে। কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতিতে ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন এক নির্মম সত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *শিক্ষা* নামক প্রবন্ধগ্রন্থে মাতৃভাষায় শিক্ষানীতির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য গ্রন্থের 'শিক্ষা-সংস্কার' নামক প্রবন্ধে ইংরেজি ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের ফলে আইরিশ ভাষা এবং আয়ারল্যান্ডের শিক্ষার পরিণাম গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আয়ারল্যান্ড স্থানীয় শাসনাধীনে থাকাবস্থায় আইরিশ ভাষাতেই শিক্ষাদান করা হতো। কিন্তু ইংরেজদের আক্রমণ আইরিশ ভাষার শিক্ষানীতি ধ্বংস করে দেয়। উনিশ শতকে আয়ারল্যান্ডে ন্যাশনাল স্কুল শিক্ষাপ্রণালির উদ্দেশ্য ছিলো ইংরেজি ছাঁচে আইরিশ জাতিকে গড়ে তোলা। এর পরিণাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য:

> ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত তাহাই হইল। মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আইরিশ-ভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল আর বাহির হইল পঙ্গু মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া।[৬]

ভাষা-সাম্রাজ্যবাদকে ফিলিপসন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদেরই অঙ্গ হিসেবে দেখিয়েছেন। সমাজ-রাজনৈতিক অঙ্গনে চর্চিত মর্যাদার প্রশ্ন এতে জড়িত। এই মর্যাদার প্রশ্নেই নিজেকে সমুন্নত রাখতে স্থানীয় ভাষার উপর বিদেশি-বিজাতীয় ভাষা আধিপত্য চালায় ক্ষমতার স্মারক হিসেবে। আমেরিকান এক ভাষাবিজ্ঞানী পৃথিবীর সাত হাজার ভাষার ৯০ ভাগই এই লড়াইয়ে মৃত হয়ে যাবে বলে ১৯৯২ সালে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানী মৃণাল নাথের বক্তব্য: 'মর্যাদার সম্পর্ক অনুসারে ভাষাও তিন ধরণের হয়ে থাকে: উপরিস্তর (Superstratum) অধঃস্তর (Substratum) এবং সমস্তর (Adstratum)'[৭]। যখন কোন রাষ্ট্রে একটি ভাষা সাম্রাজ্য বিস্তার করে তখন তাকে উপরিস্তর ভাষা বলা হয় এবং ডোমিনেটেড ভাষাটি হলো অধঃস্তরীয় ভাষা। কোন রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা সমান মর্যাদা পেলে সেগুলোকে সমস্তরের ভাষা বলা হয়। বাংলায় ইংরেজি ভাষা উপরিস্তরের ভাষা এবং বাংলা বহুযুগ হতেই ডোমিনেটেড অধঃস্তরের ভাষা হিসেবে থেকেছে। একুশ শতকে এসেও স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের উপর পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করে আছে ইংরেজি ভাষা। বাংলার শিক্ষানীতিতে এর প্রভাব স্পষ্ট।

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে। বঙ্গদেশে উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ারই ফল হলো রাজভাষা ফারসি, ইংরেজি। আর্যরা বেদ হাতে নিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে পাঞ্জাবের সিন্ধুপ্রদেশে প্রবেশ করে। এসেই ভূমিপুত্রদের মূলভূমি হতে বিতাড়িত করে। শাসক-অভিজাতদের ভাষা হিসেবে তখন সংস্কৃত হয় সাহিত্য সাধনা এবং শিক্ষার বাহন। 'এ ছাড়াও আরও কত জাতি এদেশে বিজয়ীর বেশে এসেছে– সে খবর কারো জানা নেই সত্য, কিন্তু অনুমান করা যায়, এই জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ চিরকাল বিদেশী বিজিত দেশই ছিল।'[৮] পর্তুগিজ, ফারসি, ইংরেজি, উর্দু বাংলায় বিদেশি শাসকদের ভাষার প্রতিনিধি। পবিত্র সরকারের ভাষ্যমতে, 'প্রবলতর ভাষাটি হয় শাসকদের ভাষা, না-হয় ধর্মের ভাষা কিংবা ক্লাসিকসের ভাষা; অথবা এসব বৈশিষ্ট্যের নানারকম সমন্বয়।'[৯] বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত বিদেশি শাসকদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় 'পিজিন'[৯] ভাষা অথবা স্থানীয় ভাষা হয় 'ভার্নাক্যুলার'[১০]।

ফিলিপসন সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন তন্মধ্যে প্রথম দুটি প্রক্রিয়ারই ফল হলো ডোমিনেটেড বাংলা ভাষা। ক্ষমতার ভাষা হিসেবে বাংলাকে ইংরেজি ভাষা স্থানান্তর করে আসন দখল করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যে অভিজাত সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রেণির কথা বলা হয় তারা হলো সেই গোষ্ঠী যারা হবে সাম্রাজ্যবাদী ভাষার তল্পিবাহক। ১৮৩৫ সালে ইংরেজিকে রাজভাষা করার মাধ্যমে এর চূড়ান্তকরণ হয়। মার্কিনদেশ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯১৯ সালে একটিমাত্র ভাষার সূত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যের অবিমিশ্র কাঠামো গড়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলায় এরকম নীতির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ব্রিটিশ শাসনপূর্ব বাংলায় ফারসি ছিলো রাজভাষা। যে শেষ স্বাধীন নবাবের কথা বলা হয় তিনিও বাংলা ভাষার পৃষ্টপোষকতা করেননি। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার জোয়ার আসে। ধর্মীয় ভাবনাকে কেন্দ্র করে ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ সালে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজের জন্ম। একটির উদ্দেশ্য আরবি শিক্ষা এবং অন্যটির সংস্কৃত। ১৮১৭ সালে ডেভিড এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বেই ১৮১৪ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলেত বোর্ড অব ডিরেক্টর্সকে বঙ্গদেশে ব্রিটিশ ধাঁচের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ইংরেজি শিক্ষা যে ব্রিটিশ গভর্নরের চাপের ফল তা ড্রাফ স্পষ্টতই জানান। এর কারণ হলো কলকাতার Advanced Thingking Members of The Hindu Community পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। ১৮১৬ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল বুক সোসাইটি। সোসাইটি প্রকাশিত ইংরেজি বইয়ের একত্রিশ হাজার কপি বিক্রি হয়। 'সেকালে শিক্ষার নগণ্য হার বিবেচনায় রাখলে এই পরিসংখ্যান নিশ্চিতভাবে ইংরেজির বিজয়াভিযান

প্রমাণ করে।'[১২] ১৮২৩ সালে রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষানীতিতে পশ্চিমা বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি পরম সমাদর পায়। মূলত তাঁর শিক্ষানীতিতে ইঙ্গবাদীদের প্রতিফলন স্পষ্ট। ফিলিপসন এরকম অভিজাত সম্প্রদায়ের কথাই বলেছেন।

ভারতবর্ষের শিক্ষানীতিতে লর্ড মেকলে 'ডাউন ফিলট্রেশন' তত্ত্বে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং ভারতীয়দের নিজেদের আদবে শাসনে রাখতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসার এবং মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ বন্ধ করার জন্য বলেন। ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই চার্লস উডের কৃত সুপারিশ অনুসারে ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। উড মেকলের মতোই প্রাচ্য শিক্ষায় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। ১৮৮২ সালেই হান্টার কমিশন লক্ষ করে ইংরেজি শিক্ষার সর্বগ্রাসী রূপ। প্রাচ্য পণ্ডিতরাও যে ইংরেজি এবং সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হলেও বাংলার প্রতি উদাসীন তা সহজেই লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত ভালো না জানলে বাংলার উপর দখল জন্মানো অসম্ভব বলে মনে করতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫২ সালে যে রিপোর্ট তিনি হ্যালিডে এডুকেশন কাউন্সিলের কাছে পাঠান তা এরই প্রমাণ। ১৮৫১-১৮৫৮ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন যে শিক্ষা সংস্কার করেছিলেন কৃষ্ণকমল তার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণকমল ৫ সংখ্যক সংস্কারে উল্লেখ করেন, 'সংস্কৃত গণিত- 'লীলাবতী' 'বীজগণিত' ইত্যাদি পড়া উঠে গেল। ইংরেজিতে অঙ্কশাস্ত্রের বই পড়ানো হলো'[১৩]। মেকলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণের অনুযোগী শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেছিলেন। সেই ধাঁচেই গড়ে ওঠেছিল অনেক ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই ইংরেজি শিক্ষা ছিলো মূলত শব্দশিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে প্রসঙ্গতই ইংরেজিকে অতিমাত্রায় বিদেশি বিজাতীয় ভাষা বলেছেন। মুখস্থ শব্দশিক্ষা হলেও ভাবরাজ্যে প্রবেশ সম্ভব হয় না। তাঁর বক্তব্য: 'সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না।'[১৪] ইংরেজি উচ্চশিক্ষার বাহন হবার ফলে নব্য বাবুয়ানা সংস্কৃতির ধারক বাঙালিসমাজ এর অন্তঃসারশূন্য পাঠ্যক্রমের কুফল অনুধাবন করতে পারেনি। 'এক হিসেবে দেখা যায়, ১৮৮১ সাল নাগাদ মোট ১৭০০ স্নাতকের অর্ধেকই বেকার।'[১৫] কেননা এই শিক্ষাব্যবস্থায় মেকলে কথিত 'পশ্চিমা আদবধারী' চিন্তাভাবনাহীন স্ব-উদ্যোগহীন দাস তৈরির নীতি ছিলো। ১৮৮২ সালেই হান্টার কমিশন লক্ষ করে হিন্দু স্কুলে আগত বাঙালি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কৃতকার্য তারাই হতো যারা 'ভার্নাক্যুলার' অর্থাৎ শাসিত মাতৃভাষা থেকে এসেছে।

১৮৯৪ সাল অবধি বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা সর্বব্যাপী হয়। ১৯০৪ সালে প্রবেশিকা হতে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে মাতৃভাষায় পরীক্ষা নেবার নিয়ম চালু হয়। ১৯৪৭ পরবর্তী বাংলায় তৈরি হয় নতুন ইস্যু। ১৯৬১ সালে এস. এম. শরীফের তত্ত্বাবধানে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে ধর্মশিক্ষার ভার লক্ষণীয়।

শিক্ষার মূলে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক যুক্তিবাদীতার কথা বলা হয় গুরুত্ব সহকারে। শিক্ষার বিশেষ উপাদানকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। যথা:

১. দার্শনিক
২. বৌদ্ধিক
৩. প্রবৃত্তি বা ইচ্ছাশক্তিমূলক।

বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটি দুটি ধারায় বিভক্ত। মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক। মনস্তাত্ত্বিক দিকটি শিক্ষার্থীর মনোযোগকে কেন্দ্র করে ঘোরে। একুশ শতকে পদার্পণ করেও শিক্ষার বিশেষ উপাদানভিত্তিক বিকাশের ধারণায় আমাদের গোঁজামিল। শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ও ধারণ ক্ষমতার উন্নতি সাধনে মাতৃভাষা বাংলার বিকল্প নেই। এজন্য হায়াৎ মামুদ মৌলিক শিক্ষার স্তরে অন্তত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার একমাত্র বাহন করার পক্ষপাতী। কিন্তু ঔপনিবেশিক রক্ত আমাদের মধ্যে হীনম্মন্যতার দেয়াল তৈরি করে দিয়েছে। কিন্ডারগার্টেন এবং ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ হাতছাড়া হলে জাত গেল বলে মনে হয়। এজন্যই পবিত্র সরকার *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ* গ্রন্থে বলেন: 'বাংলার উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্ন-তাড়িত বিশ্বায়নের ঘোড়সওয়ার মধ্যবিত্তকে আত্মভাষাপ্রেম কে শেখাবে?'[১৬]

ইঙ্গবাদীদের ইংরেজির প্রতি যে অন্ধ অনুগ্রহ তা একুশ শতকে প্রবেশ করেও বাঙালি সমাজের মজ্জায় মজ্জায় গাঁথা। মনোজাগতিক অনুষঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদরা যে মনোযোগের উপর জোর প্রদান করেন তা মূলত শিশুর মনোবৃত্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা। কিন্তু ইংরেজির মতো বিজাতীয় ভাষা আমাদের শিক্ষাভাবনার প্রাথমিক স্তরেই চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে মনোবৃত্তির বিকাশ অপেক্ষা মুখস্থবিদ্যার ভারে জড়তা আর অন্ধত্বই হয় আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ফল। ঔপনিবেশিক বাংলায় ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারি চাকরিতে ইংরেজি আবশ্যক বলে যে ফতোয়া জারি করেছিলেন এর ফলে যে ইংরেজি শিক্ষার ব্যগ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল তার রেশ এসময়ে আরও শক্তিশালী মনে হয়। অথচ চীন, জাপান, রাশিয়ার মতো একভাষিক রাষ্ট্রগুলো দিব্যি বিশ্বমানচিত্রে মর্যাদার সাথে অবস্থান করছে। কিন্তু বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে জড়ত্ব ও পঙ্গুত্ব গ্রহণের খেলা চলে। ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও আমাদের দীনতা ও ভিক্ষাবৃত্তি লক্ষণীয়। ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তির তিনটি দিক বিদ্যমান-

১. অনুভবশক্তি
২. কল্পনাশক্তি
৩. চিন্তাশক্তি

রবীন্দ্রনাথ ভাষার সঙ্গে চিন্তা ও ভাবের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তাঁর মতানুসারে বাল্যকালই হলো ভাষার সঙ্গে চিন্তা, ভাব ও জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য বিধানের শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত সময়। এজন্যই তিনি গড়েছিলেন শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন। ব্রহ্মচর্য শিক্ষার কথা বলেন যেখানে প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানবভাষার সঙ্গে আবেগ, চিন্তা ও জীবনরসের সন্ধান পাওয়া যাবে। আন্তর্জাতিকভাবে ইংরেজির অবস্থান অপ্রতিরোধ্য। 'এ কথা বিবেচনা করেই, আমাদের দেশে সম্প্রতি ইংরেজি শেখার হুজুগ পড়ে গেছে।'[১৭] ফলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজির প্রভাবে আইরিশ জাতির যে ধ্বস নেমেছিল আমাদের অবস্থা তেমনি। রবীন্দ্রনাথ এই পরিস্থিতির বর্ণনায় বলেছেন:

> পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না।[১৮]

এজন্য একে 'কলের শিক্ষাপদ্ধতি' বলেও অভিহিত করেন। বর্তমানে এই যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ যথারীতি চোখে পড়ে। বছরের পর বছর চলে ধরাবাঁধা পাঠ্যক্রম। মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার সর্বত্র ইংরেজির রাজত্ব। ব্যবসায় শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে ইংরেজিতে পাঠদান ও পরীক্ষণ পদ্ধতি। অথচ ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৭ সাল অবধি বাংলায় শিক্ষাপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞান শাখায় কয়েকশো ডাক্তারি বই বাংলায় ছাপা হয়েছিল। কিন্তু বাংলায় এখন উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি বই আবশ্যক।

শিক্ষার তৃতীয় বিশেষ দিক হলো মানবপ্রকৃতি বা ইচ্ছার গঠন। এর সঙ্গে সামাজিক, নীতিগত এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি যুক্ত। বাঙালিসমাজে বর্তমানে ঘুণের আক্রমণ। বিশ্বায়নের প্রভাবে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, গুগল, ইন্টারনেট ইংরেজি সংস্কৃতির আমদানি করছে। নীতিগত শিক্ষায় ধ্বস নামার ফলে ভাঙছে পারিবারিক ও সমাজকাঠামো। ধর্মশিক্ষায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু পর্যায়ক্রমে অবস্থান করলেও বাংলার অবস্থান নেই। ফলে তোতাপাখির মতো মুখস্থ তো হয় কিন্তু মানববৃত্তির নাগাল পায় না।

সুনির্দিষ্ট শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা অন্যতম। বাল্যকাল হতে যে ভাষাশিক্ষা চলে সেখানে দেখা যায় শিক্ষকের আনাড়িপনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন এসকল শিক্ষকরা না ভালো ইংরেজি জানেন না ভালো বাংলা তাদের আয়ত্তে। শিক্ষককে শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীর দেহ এবং মনের সংযোগ সাধনে তৎপর হতে হয়। *Principles And Methods of Teaching* গ্রন্থে বলা হয়: In teaching, it is true, we have to do with the pupils body as well as with the mind.'[১৯] কিন্তু যেহেতু শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে নিজেরই আয়ত্তাধীন নয় সেহেতু বহু জিজ্ঞাসা নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীর আগমন তো ঘটে কিন্তু বের হতে হয় জড়ত্ব নিয়ে। এজন্য আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে কাজী আবদুল ওদুদ 'শিক্ষকদের প্রদত্ত শিক্ষার মূল্য যাচাই'-এর কথা বলেন। তিনি মনে করেন আমাদের শিক্ষকরা মনোজীবী নন ভাবপ্রবণ। ফলে তাদের পক্ষে ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটানো সম্ভব হয় না। অন্যদিকে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে 'ডুয়িং থিওরি' অর্থাৎ নিজস্ব চিন্তাভাবনায় নিজের মাতৃভাষার প্রয়োগে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধনের অভাব বোধ হয়। প্রাথমিক শিক্ষা এবং উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রেখেই প্রতিনিয়ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব প্রদর্শন করে। নিজেরই আয়ত্তাধীন নয় এমন শিক্ষকদের দ্বারা ভাষাশিক্ষার ফলে বিশ্বায়নের সঙ্গে পা মেলাতে যখনই উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে পা ফেলে বিপত্তি বাঁধে। বিদেশি ইংরেজি ভাষাকে আয়ত্তে আনতে গলদঘর্ম হতে হয়। ফলাফল শূন্য। কেননা তখন ইংরেজি আয়ত্তে আনতে গিয়ে ভাব ও চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলতে হয়। মাতৃভাষা হয় অবহেলার শিকার। ইংরেজ আমলে বিদেশি শাসকের প্রভাবে বাংলা পিষ্ট হয়। অভিজাত এবং সুবিধাভোগী শ্রেণির বদৌলতে ইংরেজির প্রসার হয়। বর্তমানে বিশ্বায়নের সুযোগে ঔপনিবেশিক শাসনের পরোক্ষ প্রভাবে নিজের ঘরেই বাংলা পরবাসী হয়ে বাস করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গেছে কিন্তু সামস্রাজ্যবাদ নিঃশেষ হয়নি। 'ইংরেজ গেছে, কিন্তু ইংরেজি যায়নি।'[২১] মফস্বলবাসী, শহুরে অভিজাত শ্রেণি, নগরায়ণে র প্রভাবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাত ধরে ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান বাংলার শিক্ষানীতির মূল জায়গা দখল করে আছে।

ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ বাংলাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাবে তা ঠিক বলা যাচ্ছে না। কারণ বাংলা ভাষার কৃতঋণ ক্ষমতা বেশ প্রবল। এর ফলে অন্যভাষার শব্দকেও নিজের আদলে করে নিতে পারে। ইংরেজি ভাষার বহু শব্দ এই ভাষাভূমিতে দণ্ডায়মান। সেগুলো এখন বাংলা শব্দ বলে গণ্য হয়। সমস্যা হলো এর প্রভাবে সৃষ্ট শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বরূপ। কেননা শিক্ষা হলো জাতির নিজস্বতাকে সুষ্ঠুভাবে কাঠামোদান করার প্রক্রিয়া। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজির আগ্রাসনে কলাপাতায় পোলাও পরিবেশনের মতো। পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত জাতি শিক্ষায় মাতৃভাষাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। অন্য ভাষার স্থান থাকলেও তা হয় ডোমিনেটেড। আধুনিকতার এই চরমতম সময়ে শিক্ষানীতিতে নিজস্বতা না থাকলে খেই

হারিয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা তো রয়েছেই। প্রাথমিক হতে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা সমাজরাজনৈতিক ও বিশ্বমানচিত্রে আত্মপরিচয় অটুট রাখতে আবশ্যক। এ বিষয়ে বোদ্ধামহল হতে সকল শ্রেণির প্রচেষ্টা আবশ্যক। বাংলা ভাষা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হতে মুক্তি পাক, আমাদের শিক্ষায় নিজস্ব ভাবচিন্তার সংশ্লেষ ঘটুক এটাই প্রত্যাশা।

তথ্যনির্দেশ

১ Robert Phillipson, *Linguistic Imperialism*, `In the Encyclopedia of Language and Linguistics', (Aberdeen University press, 1994), p. 2223

২ ডা: মনোজ দাশ, 'ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ এবং ভাষামুক্তির সংগ্রাম', *একতা*, বর্ষ: ৬৫, সংখ্যা: ৩৭, ২৭ এপ্রিল ২০২৫; উদ্ধৃত: *http://weeeklykota.net.*

৩ Azhur pervaiz, Muhammad Kamal Khan & Ayesha Perveen, `Linguistic Imperialism', John I. Linotus (ed.), *The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching*, (John Wiley & sons, 2019), p. 1

৪ Johan Karl Friedrich Rosenkranz, *The Philosophy of Education*, (New York: D. Appleton and Company, 1899), p. 1

৫ Dr. Karl Rosenkranz, *Pedagogics As A System*, Anna C. Brackett (tr.) (Washington: The B. P. Studley Company, 1872), p. 5

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৯১

৭ মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ* (কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯), পৃ. ২৩৫

৮ আহমদ শরীফ, *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৭), পৃ. ১১৬

৯ পবিত্র সরকার, *ভাষা, দেশ, কাল* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৫

১০ 'এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালীন সংযোগের ফলে ভাষার বিকৃতি ঘটে। একে বিকৃতি না বলে কেউ কেউ পরিবর্তন বলতে চান। এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ভাষাকে সুকুমার সেন বলেছেন মিশ্র ভাষা। সেই পরিবর্তনের রূপ হল পিজিন ও ক্রিয়োল। পিজিন প্রধানত ইউরোপীয় জাতিগুলোর উপনিবেশ বিস্তারের ফল।' উদ্ধৃত: সুভাষ ভট্টাচার্য, *ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২), পৃ. ১৪৫

১১ 'ভার্নাক্যুলার' হলো শাসিত ভাষা। ডেভিড ক্রিস্টাল বলেন: 'A term used in Sociolinguistics to refer to the indigenous language or dialect of a speech community, e. g. the vernacular of Liverpool, Berkshire, Jamaica etc.' উদ্ধৃত: David Crystal, *A Dictionary of Linguistics and Phonetics* (USA: Blackwell Publishing, 2008) p. 511

১২ হায়াৎ মামুদ, *প্রবন্ধ-সংগ্রহ* (ঢাকা: নবযুগ, ২০০৮), পৃ. ১৯৮

১৩ অলোক রায়, *উনিশ শতকে নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান* (কলকাতা: অক্ষর, ২০১৯) পৃ. ২২৫

১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩

১৫ Asok sen, *Iswar Chandra Vidyasagar and His elusive milestones*, (Calcutta: Riddhi-India, 1977); উদ্ধৃত: মোহম্মদ আজম, *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: আদর্শ, ২০২৪), পৃ. ৯৫

১৬ পবিত্র সরকার, *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ* (কলকাতা: দে'জ, ২০০৩), পৃ. ১৩৬

১৭ গোলাম মুরশিদ, *বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য* (ঢাকা: প্রথমা, ২০২৩), পৃ. ১২৪

১৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

১৯ Charles C. Boyer, *Principles And Methods of Teaching* (Philladephia: J. B. Lippincott Company, 1899), p. 11

২০ কাজী আবদুল ওদুদ, *নির্বাচিত রচনা ১* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ১৯৭

২১ অন্নদাশঙ্কর রায়, *প্রবন্ধ* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, ২০১৩), পৃ. ২০১